# ফ্যান দাও

সম্পাদনা

## তসলিমা নাসরিন

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৯

# নিবেদন

আমার তখন সবে বারো পেরোচ্ছে—বাবা হঠাৎ বাড়িতে ঘোষণা করলেন এখন থেকে একবেলা ভাত খাওয়া হবে, দুবেলা রুটি। আমরা ভাইবোনেরা তখন তিনবেলা ভাত খেতাম, ঘি-চিনি মাখা গরম ভাত খেয়ে সকাল দশটায় স্কুলে যেতাম, পাঁচটায় ফিরে এসে আবার ভাত, রাতেও খেতাম ঘুমোবার আগে। হঠাৎ দু'বেলা রুটির কথায় চমকে উঠলাম, ভাবলাম বাবা বোধহয় গরিব হয়ে গেছেন, চাকরি বাকরি চলে গেছে। তখন প্রায়ই দেখতাম বাবা গম্ভীর মুখে সন্ধে থেকে বসে থাকতেন বারান্দার কোণায়, লোহার চেয়ার পাতা ছিল সেখানে। মা চা দিতে গেলে বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন 'ঈদুন, মেপে ভাত রেঁধো, আবার আকাল পড়েছে। সর্বনাশা আকাল।' রাতে আমাদের ইংরেজি গ্রামার পড়াতেন বাবা, তাঁর প্রতিদিনের রুটিন তিনি ভুলে গেলেন। বাবার হঠাৎ এমন বদলে যাওয়া দেখে আমরা ভাইবোনেরা অবাক হতাম, পড়ালেখার শাসন কমল কিছু, খেলার মাঠে সময় হয়ত বেশি দিতে পারছি, কিন্তু মাঠ থেকে টেনে নিয়ে মা যেমন মুখে খাবার ঠেসে দিতেন, তেমন আর করেন না, পেট চিঁ চিঁ করে ক্ষিদেয়। চুলোর আগুনে জল ছিটিয়ে মা সারাদিন বিষণ্ন শুয়ে থাকেন। ঠিক ঠিকই একদিন গম এল বাড়িতে, গাদা করা গমের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিতে যত আরাম, এটি ভেঙে রুটি করে খাওয়া কী যে বিচ্ছিরি, তা আমার বারো বছর বয়সে ভাল টের পেয়েছিলাম। আটার মণ্ড গলায় আটকে যেত, চোখে জল চলে আসত, বাবা বলতেন 'অভ্যেস কর, সারাদেশের লোক ভাত পাচ্ছে না।' আগে স্কুল থেকে ফিরে ভাত খেতে বসলে খেলার মাঠে যাবার তাড়া এত বেশি থাকত যে আমি ছিটিয়ে ফিটিয়ে নাকে মুখে কিছু গুঁজে দৌড়োতাম, পেছন থেকে মা 'লক্ষ্মীছাড়া' বলে ডাকতেন, আমি কি আর ফিরি! রাতে থালার ভাতকে হাতের বেড়ায় দু'ভাগ করে রাখতাম, ছোট ভাগটা খাব। আমাকে খাওয়াবার নানা কৌশল মাকে শিখতে হত, ব্যাঙমা ব্যাঙমীর গল্প, লালকমল নীলকমলের গল্প। গল্প শোনানো ছাড়াও মা আরেক রকম কৌশল করতেন, থালের কিনারে ছোট ছোট ভাতের গোল্লা বানিয়ে রাখতেন, এক একটা নাম দিতেন গোল্লাগুলোর। কোনওদিন মানুষের নাম, কোনওদিন পাখির, কোনওদিন ফুলের। নামের আকর্ষণে আমি যেন ভাতটুকু খেয়ে নিই এই ছিল তাঁর ইচ্ছে। হয়ত ভাতের একটি গোল্লার নাম দোয়েল। চড়ুই, বাবুই খাওয়া হয়ে যেত, আমি 'আর খাব না' বলে যেই না ঘাড় ফেরাতাম, মা বলতেন 'দোয়েল পড়ে আছে, খাবি.না?' দোয়েল আমার প্রিয় পাখি, দোয়েলের মায়ায় আমাকে খেতে না চাওয়া ভাতও খেতে হত। তবু লুকিয়ে কত ভাত ফেলে দিয়েছি জানালা দিয়ে! থালার সবটুকু খেতে হবে অর্ডার দিয়ে মা হয়ত একটু আড়াল হয়েছেন অমনি আমি কর্ম সাবাড় করেছি, দু'পাটি দাঁত শক্ত করে চেপে রাখতাম যেন কেউ না খাওয়াতে পারে। চুয়াত্তরে যখন রুটি খেতে হত, মনে পড়ত ভাত নিয়ে আমার হেলাফেলা করার কথা, ভাতের তৃষ্ণায় বুক ফেটে যেত। ভাত যে কী চমৎকার সুস্বাদু খাবার তা চুয়াত্তরের রুটি আমাকে বুঝিয়ে ছেড়েছে। একদিন আমাদের বাড়ির দরজায় পাঁচ ছ বছরের একটি ছেলে এসে দাঁড়াল। হাড়ের ওপর

চামড়া বসানো, একতিল মাংস নেই সারা গায়ে। জগতে ভূত বলে কিছু না থাকলেও লোকে বলে 'ভূত দেখার মত চমকে ওঠা', আমি ভূত দেখার মতই চমকেছিলাম ইসরাইলকে দেখে। প্রথম তো ওর গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরোয়নি। সে যে কিছু খেতে চায় তাও বলতে পারেনি। তার খাবার চাই, এ আসলে বলে বোঝানোর কথাও নয়, তার শরীরখানা কি কিছু বলতে বাকি রেখেছে? আমাদের ভাগের ভাতটুকু এনে ওকে খেতে দিয়েছিলাম, ও গিলতে পারত না প্রথম প্রথম, কষ্ট হত। তিনদিন পর নিজের নাম বলতে পেরেছিল—ইসরাইল। ধীরে ধীরে আমাদের চোখের সামনে ও বেঁচে উঠল। এক রাতে শেরপুকুর পাড়ে দেখি একটি আমার বয়সী মেয়ে পড়ে আছে, তাকে শেয়ালে খাচ্ছে। চারদিকে হা অন্ন হা অন্ন রব, আস্ত কতগুলো কঙ্কাল এসে ফ্যানের জন্য দরজায় দাঁড়ায়, আমরা চমকে চমকে উঠি। বাবা তখন পঞ্চাশের মন্বন্তরের গল্প শোনাতেন, বলতেন—দশ টাকা মন চাল ছিল, সেই চাল দাঁড়াল আশি টাকায়। টাকা নিয়ে মানুষ ঘুরত, কোথাও চাল পেত না।

বাবাকে জিজ্ঞেস করতাম—মানুষ তবে খেত কী?

বাবার চোখে জল চলে আসত, বলতেন—কচুঘেঁচু খেত, শাপলা সেদ্ধ খেত, কলাগাছের 'মাইন' খেত।

এসব শুনে যে আটার রুটি আমাদের গলায় ঢুকতে চাইত না, সেও বেশ স্বাদের মনে হত। বুঝতাম বাবাকেও কলাগাছ চিরে ওর ভেতরের শাদা বস্তুটি খেতে হয়েছে। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে ভোগা মানুষ তিনি, ছেলেমেয়েদের কচুঘেঁচু খেতে হয় কিনা, ভাতের ফ্যানও না জোটে কি না—দুর্ভিক্ষের গন্ধ ভাসা হওয়ায় বসে বাবা এই এক দুশ্চিন্তাই করতেন।

ঊনিশ'শ তেতাল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারি থেকেই ভাত চাই, ভাত না হোক ফ্যান চাই, আর্তধ্বনি। এই ফ্যানও না পেয়ে জুন জুলাই থেকে মানুষ মরতে শুরু করল। পথে ফুটপাতে হাটে বাজারে ঘাটে মানুষ মরছে। গোটা বাংলায় তখন ভাতের জন্য চিৎকার, আকাশে শকুনের ভিড়, লাশ-পচা দুর্গন্ধে ভেসে উঠছে বাতাস। বাজারে চাল নেই। মুন্সিগঞ্জ, নাটোর, কলকাতা, পটুয়াখালিতে মানুষ মরছে। আগস্টে খবর বেরোল বাংলায় ঘোর মন্বন্তর। 'এখনও শোনা যায় চল্লিশের গর্জন' প্রবন্ধে— শ্রীপান্থ লিখেছেন—'১৩৫০ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ই জুলাই ১৯৯৩) এর এই মন্বন্তর তেরশ' পঞ্চাশের অবদান নয়, ১৯৪৩-এর পটভূমি রচিত হয়েছিল সেই ১৯৪১ সালে। ....স্বদেশের মানুষ ভিক্ষাপাত্র হাতে কঙ্কাল হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায়। চাল নয়, ভাত নয়, তারা শুধু ফ্যান চায়।... ১৯৪৩ থেকেই লেখা হচ্ছে মানুষের তৈরি এই দুর্ভিক্ষের কাহিনী। গবেষকরা হিসেব করে দেখেছেন আগের চার বছরের তুলনায় আউশ আমন এবং বোরো এই তিন ফসলি দেশে ১৯৪২ সালে আউশের উৎপাদন ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু কম। কম মানে শতকরা ১০০-র বদলে ৯৭ ভাগ। প্রধান ফসল আমন উৎপন্ন হয়েছিল আরও কিছু কম। আগের চার বছরের তুলনায় শতকরা তিরাশি ভাগ। এই ঘাটতির কারণ '৪২ সালের অক্টোবরে মেদিনীপুর ও দক্ষিণ বঙ্গে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং ধানের মড়ক। তবে আকালের পেছনে অন্য কারণও ছিল। ... পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মান নাৎসি বাহিনী যেমন বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে যাচ্ছিল একেকটি দেশের ওপর দিয়ে, পূর্ব রণাঙ্গনে জাপানি ফৌজও তেমনি এগিয়ে আসছিল ঝড়ের বেগে। রেঙ্গুনের পতন ১৯৪২ সালের ১০ মার্চ। সুতরাং বর্মা থেকে চাল আমদানি বন্ধ। ঘাটতি আরও সে কারণেই।...তাছাড়া গম আমদানি করা হয়েছে বছরের

দ্বিতীয় ভাগে, গোড়া থেকে নয়। বিয়াল্লিশ সালে যা আমদানি করা হয়েছিল, সিংহল প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। সৈন্যদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল মজুত ভাণ্ডার। দ্বিতীয়ত, গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের ক্ষমতা ছিল না কিনে খাওয়ার। কারণ খাদ্যশস্যের, বিশেষ করে চালের দাম বাড়ছিল লাফিয়ে লাফিয়ে। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে চালের পাইকারি দর ছিল মন প্রতি ১৩ থেকে ১৪ টাকা। ১৯৪৩ এর মার্চে তা দাঁড়ায় ২১ টাকা, মে মাসে ৩০ টাকা, আগস্টে ৩৭ টাকা এবং বেসরকারি মতে আরও বেশি। চট্টগ্রামে অক্টোবরে চালের দাম পৌঁছোয় ৮০ টাকা মনে। ঢাকায় ১০৫ টাকায়। ...১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে বালাম চালের মন প্রতি দর ছিল ৭ টাকা থেকে ৭ টাকা চার আনা। বিয়াল্লিশের জুলাইয়ে ৭ টাকা বারো আনা থেকে ৮ টাকা। ডিসেম্বরে ১৩ থেকে ১৪ টাকা, অথচ পরের বছর অক্টোবরেই কিনা ১০৫ টাকা! ...ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং ধানের মড়কের ফলে অনেক ভূমিহীন শ্রমিক বেকার। দুর্ভিক্ষে না খেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ দিয়েছিল এই ভূমিহীন শ্রমিক, মাঝি মাল্লা, জেলেরা এবং যাঁরা ধানভেঙে পেট চালাতেন, তাঁরা। কলকাতার পথে প্রধানত তাঁরাই কঙ্কালে কঙ্কালে লিখে রেখে গিয়েছিলেন সেদিন মানুষের উদাসীনতা আর হৃদয়হীনতার এক কলঙ্ক কাহিনী। ...সব যানবাহন তখন যুদ্ধ কবলিত। জাপানিরা পূর্ববঙ্গে হামলা দিচ্ছে শোনামাত্র সেখানকার চারটি জেলা থেকে ধানচাল সরিয়ে নেওয়া হয়। নৌকো দখল করা হয়। কয়েক হাজার নৌকো ভেঙ্গে ফেলা হয়। সৈন্যদের জন্য কিছু রেখে ডুবিয়ে দেওয়া হয় বেশ কিছু। একদিকে এসব বিভ্রাট, অন্যদিকে মজুত উদ্ধার এবং খাদ্য সরবরাহ নিয়ে প্রহসন। কলকাতায় মৃত্যুর মিছিল। ...গ্রাম থেকে শহরে শুরু হয়েছিল ছায়া-মানুষের মিছিল। মহানগরী কলকাতার ফুটপাতে তাদের কঙ্কালেই রচিত হচ্ছিল সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর আরেক মন্বন্তরের হৃদয় বিদারক বিষাদ সিন্ধু।'

মোটা ভাত দেখলে মা বলেন 'কন্ট্রোলের চালের ভাত'। আসলে 'কন্ট্রোল' শব্দটি মায়েদের আমলের শব্দ। দুর্ভিক্ষের সময় 'কন্ট্রোলের দোকান' চালু হয়েছিল। তখনই চালু হয় রেশন, কিউ, রেশনের চাল, কাঁকরমণি চাল এসব। রেশনে চিনি কেরোসিন কাপড়ও পাওয়া যেত। মোটা চাল মোটা চিনি মোটা কাপড় দেখে আমরাও চিনতে পারি এসব 'কন্ট্রোলের জিনিস'। আমাদের আমলে 'রেশন' রয়ে গেছে, চালু হয়েছে 'ন্যায্যমূল্যের দোকান'।

—আচ্ছা ক'জন মরেছিল সেই দুর্ভিক্ষে? এখনও যদি মাকে জিজ্ঞেস করি মা শিউরে ওঠেন। বলেন—লাখ লাখ।

অমর্ত্য সেন হিসেব করে দেখিয়েছেন গোটা দুর্ভিক্ষে মানুষ মরেছে প্রায় তিরিশ লক্ষ। তখন খবরের কাগজে বেরোত বাবা তার মেয়েকে বিক্রি করে দিয়েছে বারো আনা কী এক টাকায়, স্বামী তার স্ত্রী কন্যাকে পাঁচ দশ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছে। পেটে ভাত নেই, তার ওপর জাপানি বোমা, বনে আগুন লাগলে বুনো জন্তু যেমন পালায়, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা পালায়, তেমন করে মানুষ পালিয়েছে একবার গ্রাম থেকে শহরে,আরেক বার শহর থেকে গ্রামে। আর যাই বলি আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশে, রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলায়, নজরুলের বাংলাদেশে, জীবনানন্দের রূপসী বাংলায় এই কালান্তক দুর্ভিক্ষ বাঙালির প্রাপ্য ছিল না।

১৩৫১ সালে সুকান্ত ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে 'আকাল' নামে একটি কবিতা সংকলন বের হয়েছিল। ১৩৭৩ সালে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা দিয়ে আবার

সারস্বত লাইব্রেরি থেকে সংকলনটি পুনর্মুদ্রণ হয়। আজ ১৪০০ সালে, অর্ধ শতাব্দী পর আমরা স্মরণ করছি সেই সর্বনাশা মন্বন্তরকে। দুর্ভিক্ষের কবিতা সংকলনের আগে একটি গল্প সংকলন বেরিয়েছিল, কোনও কবিতা সংকলন হয়নি বলে সুকান্ত আক্ষেপ করেছেন,আকালের কথামুখ-এ লিখেছেন 'অবশ্য এমন কবিও আছেন যাঁরা কবিতাকে দুর্ভিক্ষের বর্ণনায় কণ্টকিত হতে দেখলে শিউরে ওঠেন। তাঁরা নিজেদের না পারুন, কবিতাকে দুর্ভিক্ষের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।' সুকান্ত আরও লিখেছেন—'তেরশ' পঞ্চাশ কেবল ইতিহাসের একটা সাল নয়, নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস। সে ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, ঘর ভাঙা গ্রাম ছাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে পথে মৃত্যুর ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস। তাই যাঁরা প্রকৃত কবির মত স্বদেশবৎসলের মত পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষে বিভ্রান্ত জনমনকে দিলেন সান্ত্বনা, অন্ধকারে বসে গাইলেন সূর্যোদয়ের গান, তাঁরা আমাদের অভিনন্দনীয়।'

অভিনন্দন আমরা জয়নুল আবেদিনকেও দেব। যাঁর অসাধারণ তুলির টানে ফুটপাতের কাক ও কঙ্কাল আমাদের পিঠে চেতনার চাবুক হয়ে লাগে। মনে পড়ে চিত্তপ্রসাদ এবং সোমনাথ হোরের ছবির কথা। রামকিঙ্করের ছবি এবং ভাস্কর্যের কথা। নানা সময়ে দেখা কত না ছবি। —ছায়া মানুষের মিছিল, ফুটপাথে মরণ-শয্যায় বাংলার গাঁয়ের মানুষ, পুকুড় পাড়ে গাছের তলায় হাড়ের স্তূপ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গায়ে গা লাগিয়ে মন্বন্তর এসেছিল। সমর সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ তাঁদের কবিতায় যুদ্ধ ও মহামারিকে এক স্তবকে গেঁথেছেন। ১৯৪২ সালে সুকান্ত লেখেন 'আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়/ আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়।' (রবীন্দ্রনাথের প্রতি)। বুদ্ধদেব বসু 'কলকাতা' কবিতায় লিখেছেন ,'দুর্ভিক্ষ উড়ে এলো। প্রলয়ের ফুলকি এলো ছুটে। / টান পড়ল তোমার স্নায়ুতে, দারুণ বান ডাকলো শিরায়।/ ত্রাসে, বিক্ষেপে, উৎসাহের উচ্ছ্বাসে , আর কঙ্কালের কান্নায় মিশে গেলো/ আমার যৌবনের অন্তিম নিশ্বাস। / মানুষের ছিন্নভিন্ন মাংস তোমার বৃষ্টিতে ধুয়ে গেলো। / ক্ষুধিতের ক্ষীণ গোঙানি ট্রাফিকের শব্দে ডুবে গেলো, /ব্ল্যাক আউটে ঘন-হওয়া ঘাস নির্মূল হয়ে মুছে গেলো/উদ্বাস্তুর অস্থির পায়ে-পায়ে। /মড়কের সংগ্রাম, হৃদয়ের মৃত্যু, নৈরাজ্যের অন্ধকার,/ ভেদ, বিচ্ছেদ, কাঁকরের মতো তর্ক, দাঁতে দাঁত ঘষা মতবাদ—/ বাংলার বিদীর্ণ বুকের উপর ফুটে উঠলো, ঝ'রে পড়লো/আমার শেষ গ্রীষ্মের কৃষ্ণচূড়া। /··· গাছ মরে গেলো। পাখি নেই। /সান্ত্বনা কোথায়?—সেই যখন এরোপ্লেনের আকাশ ভরে আতঙ্ক···।' সমর সেন লিখেছেন, 'দুকোটি ক্ষুধার অভিশাপ/সংহত বাংলাদেশে / চোরে চোরে মাসতুতো ভাই,/ নিবিড় মিতালি মহাজন ও শকুনে। /দুর্দিন রপ্তানি কিছুদিন বন্ধ করো/ এদেশে, হে দেব! ক্ষান্ত করো দাক্ষিণ্য দারুণ।/ বিপুলা পৃথিবী। অন্য দেশে লেগেছে আগুন, / কালশিটে কালো মেঘ, সূর্যাস্তের রং যেন মানুষের খুন/ কিন্তু সেখানে, হে দেব, আগ্নেয় স্ফুলিঙ্গে/ ধূমায়িত অরণ্যপ্রান্তরে বিদীর্ণ পাহাড়ে/ গুপ্ত স্তরে পলিমাটি জমে; দিগ্বিজয়ী সৈন্যদল,/ দর্পহর বর্বর বাহিনীর, সহজ সকাল আনে;/ সেখানে ট্যাঙ্কের শব্দ স্তব্ধ হলে/বিধ্বস্ত মাটিতে আনে ট্রাক্টরের দিন/ জোসেফ স্টালিন।' (২২ শে জুন ১৯৪৪)। এই কবিতাটি পরে পাল্টে ছিলেন সমর সেন। 'সাফাই' কবিতার কিছু অংশের সঙ্গে এই কবিতার কিছু অংশ জুড়ে '২২ শে জুন' নামে স্বতন্ত্র একটি কবিতা লিখেছিলেন। সুভাষের কবিতায় 'ভাঙলো চিবুক—ঠেকানো হাতের

নিদ্রা—/বাগানে শুকনো কঙ্কালসার বৃক্ষ/ খিড়কির পথে পালাবে কি কলাবিৎরা?/ —গ্রামে ও নগরে ভিড় করে দুর্ভিক্ষ।' (কাব্যজিজ্ঞাসা)। তিনি 'ঘোষণা' করেছেন, 'দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশ, /রক্তচক্ষু রাজার শাসন/ শকুনি বিশ্বস্ত বন্ধু,/ মুঠোয় শিথিল সিংহাসন;/ সর্বাঙ্গে চিহ্নিত মৃত্যু/ শবের গলিত গন্ধ ছোটে।/প্রজাপুঞ্জ ওঠে;/ আগুন লেগেছে ঘরে,/ খরসূর্য মাথার উপরে। /ভাণ্ডারে উধাও খাদ্য,/শূন্য পেটে চাষবাস চুপ/কারখানায় পড়েছে কুলুপ/দোকানে দ্বারস্থ অক্ষৌহিণী/পিছনে করুণমূর্তি পথের কাহিনী।/গহন অরণ্য আরাকান; /স্খলিত পায়ের ছন্দে/ স্পন্দিত শ্মশান। /সর্বস্বান্ত চোখে পড়ে/ বারবার হাতের শৃঙ্খল—/পলাতক প্রাণের সম্বল।...এদেশ আমার গর্ব/ এ মাটি আমার চোখে সোনা।/ আমি করি তারি জন্মবৃত্তান্ত ঘোষণা।' শারদীয় অরণিতে নবেন্দু রায় লিখেছিলেন—'নিরন্ন আমার দেশ, এদেশ আমার।' (নরক)

হ্যাঁ এ দেশ আমার, আমাদের। ১৭৬৫ থেকে ১৮৫৮ তিরানব্বই বছরে বারো বার দুর্ভিক্ষ এসেছে বাংলাদেশে, ১৮৬০ থেকে ১৯০৮ অবধি আকালে কেটেছে কুড়ি বছর। ছিয়াত্তরের (১১৭৬) মন্বন্তরে বাংলাদেশ শ্মশান হয়ে গিয়েছিল। একইরকম পঞ্চাশেও। আমাদের এই দেশে ক্ষুধার আগুন আর জ্বলতে দিতে চাই না। তবু, আমরা বাঙালিরা, অধিকাংশ বাঙালিই, নিত্য যে দুর্ভিক্ষ নিয়ে ঘর করি, তা স্মরণ করিয়ে দিতেই এই সংকলন।

১৩৫০-এ যে কবিরা মানুষের ক্ষুধার কথা লিখেছেন, তাঁরা সবাই হয়ত বিখ্যাত কবি নন কিন্তু এই নিরন্ন জাতি চিরকাল নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ থাকবে সেই কবিদের কাছে। মৃত্যু, হাহাকার, ক্ষুধা বুভুক্ষু, শ্মশান, কাফন, দুর্দিন, দুর্যোগ, মারি, মড়ক, নরক—এই শব্দগুলো তখন যাঁরা কবিতা লিখতেন, বারবার ব্যবহার করেছেন। আবার একথাও ঠিক, কিছু কবি তখন ধর্মের বন্দনা করেছেন, কেউ কেউ প্রেমেও বুঁদ থেকেছেন। তাঁদের অমানবিক আচরণ আমাকে বিস্মিত করেছে। ১৩৫০ পার করে অনেক কবিই দুর্ভিক্ষের কবিতা লিখেছেন, লিখতেই পারেন, কারণ তখনও তো ক্ষুধা ফুরোয়নি, ক্ষুধা কি এখনও ফুরিয়েছে? তবে এই সংকলনে ১৩৫০-এ লেখা কবিতাগুলোই অগ্রাধিকার পেয়েছে। সব কবিতার নিচে রচনার তারিখ দিইনি কারণ কবি কোথাও লিখে যাননি এটি ঠিক কবে লেখা, এই কবিতাগুলো কবিদের গ্রন্থ থেকে নেওয়া, যেমন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'চিরকুট' কাব্যগ্রন্থটির রচনাকাল ১৯৪১ থেকে ১৯৪৬। এই গ্রন্থ থেকে 'চিরকুট', 'স্বাক্ষর', 'বর্ষশেষ' নামের যে কবিতাগুলো নিয়েছি তা আমি অনুমান করছি ১৯৪৩-এ লেখা। অনেক কবিই পত্রিকায় যা লিখেছেন ১৩৫০-এ, পরে আবার সামান্য পাল্টে বইয়ে দিয়েছেন, বিষ্ণু দের 'চালের কাতারে' নামে কবিতাটি ৬ই শ্রাবণ ১৩৫০-এ লেখা, এটি বেরিয়েছিল অরণি পত্রিকায়, এটি পরিমার্জিত রূপে পাই তাঁর 'সাত ভাই চম্পা' বইয়ে, কবিতার নাম দিয়েছেন '১৯৪৩ অকালবর্ষা' এখানে পরিমার্জিতটিই রেখেছি। মোটা তুলট কাগজে ফোল্ডার আকারে অমিয় চক্রবর্তীর পাঁচটি কবিতা মন্বন্তরের সময় ছাপা হয়, ওতে বলে দেওয়া হয় 'অন্নার্থীর সাহায্যকল্পে এই কবিতা বিক্রয় হইবে, প্রতি ফোল্ডার চার আনা।' প্রচ্ছদে ছবি যামিনী রায়, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং বি· উটেখ-এর। ১৩৫০-এ লেখা এই কবিতাগুলো কিছু শব্দ বদলে যেমন মাড়াইকে মরাই, ঘোলাকে খোলা, শুকায়কে শুকোয়, পারাপার কাব্যগ্রন্থে ঢুকেছে। বুদ্ধদেব বসু 'শ্রাবণ' নামে যে কবিতাটি ১৩৫০-এ লিখেছেন, সেটি তাঁর 'দময়ন্তী' 'রূপান্তর' 'দ্রৌপদীর শাড়ি' কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়নি কেন, এ আমাকে ভাবিয়েছে বেশ।

১৩৫০ এর পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে 'ফ' নামের এক কবিকে পেয়েছি, জানিনা এই নামের আড়ালে বড় কোন কবি লুকিয়ে আছেন কি না। ১৩৫০ এর শনিবারের চিঠিতে কবির নাম নেই, অথচ বেশ কিছু দুর্ভিক্ষের কবিতা ছাপা হয়েছে। এই কবিতাগুলোও কবিদের কবিতার কাতারে দাঁড়াবার যোগ্যতা রাখে। আর একটি কথা, কবিতায় সে আমলের বানানই যাঁরা যা লিখেছেন, যথাসম্ভব তা-ই রেখেছি, কেবল দু চারটে শব্দ যেমন মাটীকে মাটি, সহরকে শহর, দুর্দ্দিন কে দুর্দিন না করে ভেতরে স্বস্তি পাইনি। কবিদের নামেও কিছুটা কাঁচি চালিয়েছি, নামের আগের শ্রী এবং নামের পরের বিএ, এম এ, বিটি, পি এইচডি, বার এট ল ইত্যাদি অলংকার দূর করেছি। আসলে দুর্ভিক্ষ এতই কঠোর কঠিন জিনিস, এখানে এত অলংকার মানায় না, কঙ্কালের গায়ে মণিহার পরালে দেখতে বড় বিচ্ছিরি লাগে।

তসলিমা নাসরিন
১৪০০

# সূচীপত্র


**জীবনানন্দ দাশ**
কার্ত্তিকের ভোর-১৩৫০ ১৩
এই শতাব্দী—সন্ধিতে মৃত্যু ১৩

**অমিয় চক্রবর্তী**
অন্ন দাও ১৪
১৩৫০ ১৫
নিমন্ত্রণ ১৫
অন্নদাতা ১৬

**প্রেমেন্দ্র মিত্র**
ফ্যান ১৮

**বুদ্ধদেব বসু**
শ্রাবণ ১৯

**বিষ্ণু দে**
১৯৪৩ অকাল বর্ষা ২০
এক পৌষের শীত ২০

**অরুণ মিত্র**
মরযাত্রা ২২
এবার ২৩
জঠর ২৩

**বনফুল**
সোনাটা ২৫

**যতীন্দ্রমোহন বাগচী**
সুন্দরের অন্তর্ধান ২৭

**সুকান্ত ভট্টাচার্য**
শত্রু এক ২৮
রবীন্দ্রনাথের প্রতি ২৮
বোধন ২৯
ফসলের ডাক ঃ ১৩৫১ ৩২

**জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র**
আমাদের গান ৩৪

**মণীন্দ্র রায়**
অনুভব ৩৫

**দিনেশ দাস**
পঞ্চাশের মন্বন্তর ৩৭
গ্লানি ৩৮
ডাস্টবিন ৩৮
দোলনা ৩৯
ভুখ-মিছিল ৪০

**সমর সেন**
গৃহস্থ বিলাপ ৪১
২২ শে জুন ৪৪

**শিবরাম চক্রবর্তী**
কালক্রম ৪৭
অতিথি ৪৮

**সুভাষ মুখোপাধ্যায়**
চিরকুট ৪৯
এই আশ্বিনে ৫০
স্বাক্ষর ৫২
স্বাগত ৫৩
বর্ষশেষ ৫৫

**ফররুখ আহমেদ**
ধূলিতল ৫৭
লাশ ৫৭

**কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়**
অভিশাপ ৬০

**কুমুদরঞ্জন মল্লিক**
দুর্দিনে ৬১

**কালিদাস রায়**
অপচয় ৬২

**বন্দে আলী মিয়া**
শারদ শ্রী ৬৩
সর্বহারা ৬৪
ক্ষুধাতুর নারায়ণ ৬৪

**আবু নয়ীম মোহাম্মদ বজলুর রশীদ**
ব্রডকাস্টিং ৬৬
অভিশাপ ৬৭

**গোলাম কুদ্দুস**
দ্বৈরথ ৬৯

**মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়**
মেঘ বৃষ্টি ঝড় ৭০

**বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**
আশ্চর্য ভাতের গন্ধ ৭৩
মহাদেবের দুয়ার ৭৩

**যশোদাদুলাল মণ্ডল**
ক্যালকাটা নাইটিন ফর্টি থ্রি অক্টোবর ৭৫

**সুরেশ বিশ্বাস**
কে লবে সেবার ভার ৭৬

**আবুল হোসেন**
মানপত্র ৭৭
মন্বন্তরে ৭৭

**অবন্তী সান্যাল**
কাহিনী ৭৯

**সুশীল রায়**
অরণ্য রোদন ৮১

**নীলরতন দাস**
দুর্গতি-মাঝে
এস মা দুর্গে ৮৩

**শামসুদ্দিন**
নতুন চোখ ৮৪

**সঞ্জয় ভট্টাচার্য**
মাটি ৮৫

**কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত**
মেঘমুক্ত ৮৬

**অশ্বিনীকুমার পাল**
মন্বন্তর ৮৮

**এফ. রহমান**
বাস্তব ৮৯

**যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত**
ভিখারিনী ৯১

**মোহম্মদ নওলকিশোর বোগরাবী**
এ কি স্বপ্ন? ৯৪

**অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য**
ভোরের বেলা ৯৫
দুঃসময়ে ৯৫

**মতিউল ইসলাম**
এখানে ৯৭

**সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য**
তেরোশো' পঞ্চাশ সাল ৯৮

**সৈয়দ আলী আহসান্**
নূতন সূর্যের দিন ১০০

**নকুলেশ্বর পাল**
কাল-বৈশাখী ১০৪

**প্যারিমোহন সেনগুপ্ত**
যুদ্ধ দানব ১০৫

**পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়**
হও দীপান্বিতা ১০৬

**শাহেদা খানম**
নবীন স্বপ্ন
চাহি ১০৭

**কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়**
যাবার বেলায় ১১০

**দেবনারায়ণ গুপ্ত**
আগমনী ১১১

**গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য**
জীবন ও মরণ ১১২

**মৃণালচন্দ্র সর্বাধিকারী**
জঞ্জাল ১১৩

**নবেন্দু রায়**
নরক ১১৪

**ফ**
আসন্ন শীতে ১১৬

**শনিবারের চিঠি**
**১৩৫০ থেকে**
আমরা ১১৮
হিসাব ১১৮
দুর্দিন ১১৯
ডায়ালেকটিক ১১৯
কোজাগরী ১১৯

# জীবনানন্দ দাশ

## কার্ত্তিকের ভোর — ১৩৫০

চারিদিকে ভাঙনের বড় শব্দ,
পৃথিবী ভাঙ্গার কোলাহল;
তবুও তাকালে সূর্য পশ্চিমের দিকে
অস্ত গেল, ..... চাঁদের ফসল
পুবের আকাশে
হৃদয় বিহীনভাবে আন্তরিকতা ভালবাসে।
তেরোশো পঞ্চাশ সালে কার্ত্তিকের ভোর;
সূর্যালোকিত সব স্থান
যদিও লঙ্গরখানা,
যদিও শ্মশান,
তবুও কল্কির ঘোড়া সরায়ে মেয়েটি তার যুবকের কাছে
সূর্যালোকিত হয়ে আছে।

## এইশতাব্দী — সন্ধিতে মৃত্যু

(অগণন সাধারণের)

সে এক বিচ্ছিন্ন দিনে আমাদের জন্ম হয়েছিল
ততোধিক অসুস্থ সময়ে
আমাদের মৃত্যু হয়ে যায়।
দূরে কাছে শাদা উঁচু দেয়ালের ছায়া দেখে ভয়ে
মনে করে গেছি তাকে—ভালোভাবে মনে ক'রে নিলে—
এইখানে জ্ঞান হতে বেদনার শুরু—
অথবা জ্ঞানের থেকে ছুটি নিয়ে সান্ত্বনার হিম হ্রদে একাকী লুকালে
নির্জন স্ফটিকস্তম্ভ খুলে ফেলে মানুষের অভিভূত উরু
ভেঙ্গে যাবে কোনো এক রম্য যোদ্ধা এসে।
নরকেও মৃত্যু নেই—প্রীতি নেই স্বর্গের ভিতরে;
মর্ত্যে সেই স্বর্গ নরকের প্রতি সৎ অবিশ্বাস
নিস্তেজ প্রতীতি নিয়ে মনীষীরা প্রচারিত করে।

## অমিয় চক্রবর্তী

### অ ন্ন দা ও

অন্ন দাও, অন্ন দাও—
গলির মোড়ে কি জাগ্‌বে না ধানশীষ?
জমানো সোনার রোদের সবুজ অন্ন
হাওয়ায় দোলানো আকাশে অন্ন
ভরানো মাটিতে লাগবে না?
প্রাণের ক্ষুধায় অন্ন দাও।
রাতের কান্না দিনের কান্না ঘুরে ঘুরে ওঠে
অন্ন দাও।

মূর্ছা চোখের অন্ন দাও,
বোবা বুক বলে, অন্ন দাও।
কোথাও পাথর ভাঙে না, ঝরে না অন্ন জল,
কঠিন শহরে অন্ন নেই।
ঝিমঝিম ধরে শিরায় মৃত্যু—
শরীর শুকোয়, কণ্ঠ শুকোয়, পড়ে থাকে দেহ,
অন্ন নেই।
সোনার বাংলা শূন্যে তাকায় ঃ অন্ন নেই।
ভাঙ্গা ভাণ্ডারে মাটি নিরন্ন।

অন্ন আছে,
লোভের মরাইয়ে ধ্বংসগোলায় অন্ন আছে,
পণ্যরাষ্ট্র জানে ভুবনের অন্নের পথ।
সে-পথ বন্ধ।
ভরা বন্যায় অন্ন ভেসেছে—অন্ন আছে,
ঝক্‌ঝকে ঘরে ঝড়ে মারীতেও—নেই কি অন্ন?
লক্ষ কলের অন্ন আছে।
শহর-গ্রামের কোটি জনতার
নেই শুধু চোখে সবুজ অন্ন,
সোনার অন্ন।
অন্ন দাও—
প্রাণের ক্ষুধায় একটু অন্ন দাও॥

অন্নার্থীর সাহায্যে, ১৩৫০

## ১৩৫০

হাত থেকে তার পড়ে যায় খসে
অবশ আধ্‌লা ধুলোয়।
চোখ ঠেকে খোলা অসাড় শূন্যে।
প্রাণ, তুমি আজো আছ ঐ দেহে,
আছ মুমূর্ষু দেশে।
কঙ্কাল গাছ ভাদ্রশেষের ভিখারী ডালটা নাড়ে,
কড়া রোদ্দুর প্রখর দুপুরে ফাটে।

হাতের আঙুলে স্নেহ দিয়েছিলে
চোখে চেনা জাদু আপন ঘরের বুকে—
বাংলার মেয়ে, এসেছিল তার জীবনের দাবি নিয়ে,
দুদিনের দাবি ফলন্ত মাঠে, চলন্ত সংসারে;
কতটুকু ঘেরে কত দান ফিরে দিতে।
—সামান্য কাজে আশ্চর্য খুশি ভরা।
আজ শহরের পথপাশে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কোথা
সভ্যতা ছোটে তেরোশো পঞ্চাশিকে॥

অন্নার্থীর সাহায্যে, ১৩৫০

## নি ম ন্ত্র ণ

হায়রে, নেমন্তন্ন।
সাগরপারের লোক, দেখে যাও
অন্য দেশের শিশু,
ডাকছে চোখ খুশিতে উজল
চল্‌রে, নেমন্তন্ন।

ভাঙা ভাণ্ডের তলানিতে
এই হোলো তার প্রাণের নিমন্ত্রণ ঃ
কাঙাল সারি বসেছে পথে, উপরে ওড়ে কাক,
সেখানে ছুটে-আসা।—
যে-শিশুরা আলোয় নামে, একটু পেয়েই হাসে
তাদের জন্যে এই আয়োজন।

কেমন প্রজা, কেমন রাজা, কেমন সোনার দেশ;
ভারত-মায়ের শিশুকে দেখে যাও।

ওরাও বাঁচতে চায়।
বড়ো হয়ে উঠবে প্রাণে, ভরা বাংলার কোলে—
মাটিতে ফল, মাটিতে ধান
—এদেরই নেমন্তন্ন ছিল।
বাপ-মায়ের মূর্ছাদেহ, পাশেই খেলে শিশু
শীর্ণতায় চমকে শিখা প্রাণের,
দোকানে রং, চেয়ে দেখ্‌ছে, চল্‌ছে গাড়ি,
উঁচু বাড়িতে নীল পর্দা,
সেপাই ঘোরে বড়ো দরজায়—
দূরে, দূরে, দূরে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্লান্ত হঠাৎ গড়িয়ে পড়ে,
চোখের সাম্‌নে লক্ষ লোকের—
—ফুটপাথেই ফুরোয় নেমন্তন্ন॥

অন্নার্থীর সাহায্যে, ১৩৫০

## অ ন্ন দা তা

পাথরে মোড়ানো হৃদয় নগর
জন্মে না কিছু অন্ন—
এখানে তোমরা আসবে কিসের জন্য?
বেচাকেনা আর লাভের খাতায়
এখানে জমানো রক্তপণ্য—
যারা দান দেয় তারা মুনাফায়
সাধুতার সুদ ক'ষে তবে হয় দাতা,
নয়তো তারাও রাষ্ট্রচাকায় পিষ্ট, দরদী নাগর ঃ
তাদের দেওয়ায় ফলাবে না ধান শান-বাঁধা কলকাতা।

আসো যদি তবে শাবল হাতুড়ি
আনো ভাঙ্‌বার যন্ত্র,
নতুন চাষের মন্ত্র।

গ্রামে যাও, গ্রামে যাও,
এক লাখ হয়ে মাঠে নদীধারে
অন্ন বাঁচাও, পরে সারে সারে
চাবেনা অন্ন, আনবে অন্ন ভেঙে এ দৈত্যপুরী,
তোমরা অন্নদাতা।
জয় করো এই শান-বাঁধা কলকাতা॥

অন্নার্থীর সাহায্যে, ১৩৫০